The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 17, No. 33-34, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098, e-ISSN 2408-851X
DOI : http://dx.doi.org/10.70438/dujl/173334/0001

ভাষার রাজনীতি ও রাজনীতির ভাষা, প্রসঙ্গ: ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই

মনিরুজ্জামান*

Abstract: Muhammad Abdul Hai was one of the stalwarts of linguistics in the context of the Bangla language. His work traversed well beyond his vocation as a professor of the Bangla Department at the University of Dhaka. He has played a pivotal role in the research of Bangla phonetics and phonology, and Bangla linguistics is indebted to his analyses. Beyond core theoretical linguistics, he has also worked on dialectology and sociolinguistics, culminating in one of his seminal works – namely 'Toshamod O Rajnitir Bhasha' (The Language of Flattery and Politics). This article focuses on the aforementioned seminal work with a view to discussing the language of politics and the politics of language, exploring Hai's contributions in this regard as well his pioneering research trajectory.

Keywords: Muhammad Abdul Hai, Bangla linguistics, Sociolinguistics, Language and politics, Language of flattery

১.

আলোচ্য প্রবন্ধের[১] বিষয় 'রাজনীতির ভাষা ও ভাষার রাজনীতি'। অধ্যাপক হাই বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হলেও তাঁর অবদানের ক্ষেত্রটি চার দেয়ালে সীমিত নয়, বরং আরও বিস্তৃত ছিল। বিভাগে তাঁর অবদান কোথায় নেই? ধ্বনিতত্ত্বের তিনি 'ফাউন্টেন হেড', বিভাগের তিনি স্বাপ্নিক, বাংলা ভাষার তিনি রক্ষক, অভিভাবক। প্রমিত ভাষা ও উপভাষার মত সমাজভাষারও তিনি বিশ্লেষক এবং সেই সুবাদেই তিনি রাজনীতির ভাষারও ভাষ্যকার। এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থের নাম 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা'। সেই গ্রন্থের সূত্র ধরে ও তাঁর প্রসঙ্গ টেনেই 'রাজনীতির ভাষা' নিয়ে আলোচনা আমার উদ্দেশ্য।

এ কথা অবিসংবাদিত এবং সংবাদপত্রেও উল্লেখ পাই, যেমন এই সেদিনও এই বাংলা বিভাগের এক অধ্যাপক লিখেছেন, মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা বিভাগকে নতুনভাবে গড়ে দিয়ে গেছেন।

---

* অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বলা যায় তাঁরই প্রণোদনায়, যেখানে বাংলা পঠনপাঠনই প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, সেখানে একটি রেনেসাইঁ ঘটিয়েছিলেন তিনি। কথা আছে 'এভরি নিউ আইডিয়া লিডস টু এ রেনেসাঁ'। রেনেসাঁ হচ্ছে সনাতন চিন্তার মুক্তিসাধনা। মধ্যযুগে বাংলাদেশের মানুষ ৫০০ বছর ধরে একই চিন্তায় সংস্কৃতি সাধন করেছে, একই মঙ্গল সাহিত্য— একই বৈষ্ণবীয় সাহিত্য দর্শনে নিমগ্ন থেকেছে; কোনও নতুন চিন্তায় উপনীত হতে পারেনি। এর ফলে কোনও জাগরণ বরং ঘটেনি বা ঘটতে পারেনি দেশে কোথাও। ভাষা নিয়েও কোনও নেব্রিহা (Elio Antonio de Nebrija, 1492)-র আগমন ঘটেনি, একালে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর আগ পর্যন্ত, যিনি নেব্রিহার মতোই এ কালেও মুখোমুখি হয়েছেন তাঁর প্রশাসকের। নেব্রিহা তাঁর স্পেনের কাস্তেলিয় প্রদেশের মাতৃস্থানীয় ভাষাকে লাতিন ভাষাপ্রিয় রাজন্যকর্তৃক প্রতি-প্রয়াসের হাত থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। আমাদের মনে পড়বে গত শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে সাধুভাষার দৌরাত্মের কালে প্রমিত কথ্য ভাষা সৃজনে প্রমথ চৌধুরীও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সহায়তায় কৃতকার্য হয়েছিলেন। সমভাবেই একটা জাগরণী কর্মপ্রয়াসের লক্ষ্যে প্রফেসর হাই-এর সাহসিক পদক্ষেপের জন্য নেব্রিহার প্রসঙ্গটা এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। প্রফেসর হাই-এর হাতে যেমন ঘটে রবীন্দ্র-সঞ্জীবন, যেমন রক্ষা পায় বাংলার পঠনপাঠন, যেমনি ঘটে ভাষার আধুনিকায়নেরও সুযোগ ; এবং যেমনি তাঁকে গভর্নর মোনেম খানের রূঢ় ব্যঙ্গ প্রশ্নের জবাব দিতে হয় ('আমি লিখলে রবীন্দ্রসংগীত হবে না, হাইসংগীত হবে'), তেমনি নেব্রিহাও তাঁর কাস্তেলিয় ভাষার ব্যাকরণের ভূমিকায় রাণী ইসাবেলাকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন যে, ভাষা জিনিসটা সাম্রাজ্যের দোসর, এদের এক সাথে উদ্ভব, এক সাথে অবক্ষয় ঘটে। তিনি স্পেনের ভাষাকে এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন তাঁর অসাধারণ ভাষাবোধ ও প্রতিরোধের দঃসাহস দিয়ে। প্রফেসর হাইয়ের জন্মশতবার্ষিকীতে তাই তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা।

এখানে প্রমথ চৌধুরী বা প্রফেসর হাইয়ের উল্লিখিত বিপ্লবী ভূমিকাটি ভাষাবিজ্ঞানী বা সমাজভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে ছিল কি ছিল না সেটা বিচার্য নয়। বলা চলে তাঁদের মাঝে এক 'বিদ্যাসাগরি কাণ্ডজ্ঞান'–ই কাজ করেছিল। কেননা তখন 'সমাজভাষাবিজ্ঞানে'র বা ভাষার সমাজগত চিন্তার কোনও প্রসারিত ধারণারই সাক্ষাৎ মেলে না এ অঞ্চলে। এটা তাঁদের একান্তই পুরোগামী চিন্তার ফল। সমাজ-ভাষা নিয়ে 'সোসিওলিঙ্গুইস্টিকস'-এর চিন্তার আবির্ভাব ভাষার জ্ঞানাবর্তে ঘটার আগেই মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা'(১৯৫৯)-র প্রবন্ধগুলি লেখেন। তার বহু পরে আবির্ভূত হন স্টুয়ার্ট, ট্রাজিল, ডিটমার, ফিসম্যান, গাম্পার্জ, ডেলহাইমস, ফেসোল্ড, লেবভ বা প্রাইড প্রমুখ সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানী এবং ভাষা-পরিকল্পকদের দল। তাঁর 'সুভাষণ', 'কেন লিখি', 'তোষামোদের ভাষা', 'রাজনীতির ভাষা' প্রভৃতি রচনা এই গ্রন্থেরই ফসল। সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের (ত্রয়োদশ সং. ১৯৭৯) পঞ্চম অধ্যায়ে 'শব্দার্থতত্ত্ব' আলোচনা কালে এর সামান্য উল্লেখ পাই বটে, প্রফেসর হাই-এ তার বিস্তার লক্ষ্য করি।

২. সমাজ-ভাষা-বিজ্ঞানীর মূল অবস্থান যেখানে

মুহম্মদ আবদুল হাই-এর ভাষা-চিন্তা প্রধমাবধিই ছিল শুধু ভিন্নমুখিই নয়, বহুমুখিও। তাঁর চিন্তার কয়েকটি ধারা ছিল, সমকালীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-নজরুল চিন্তা, মধ্যযুগের বিদ্যাপতি ও চট্টগ্রাম-আরাকানের মুসলিম কবিদের প্রসঙ্গ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাউল ও লোকসংস্কৃতি, আধুনিক সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও অনুবাদ এবং তাঁর আপন ক্ষেত্র ভাষা, যা ছিল বিষয় হিসাবে প্রচলিত শিক্ষাশৃঙ্খলায় যেমন নতুন তেমনি ব্যতিক্রমও। এই বিষয়টির মধ্যে আবার ধ্বনিবিশ্লেষণের বিষয়টিতো ছিলই, পাশাপাশি ছিল উপভাষা, পূর্বস্তরের ভাষা (যথা, প্রাকৃত ভাষা)-বিশ্লেষণ, সমাজভাষা এবং ভাষাপরিকল্পনা, যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে বিস্ময়করভাবে নিজেকে আভা গার্দীয় ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করে যেতে সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্র-চর্চা, ‘সাহিত্য পত্রিকা’ প্রকাশ, সরকারের রোষ এড়িয়ে পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যগ্রন্থের নব নামায়ণ তথা রূপায়ণ ঘটানো এবং সর্বোপরি সরকারকে বাংলা ভাষার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ‘বাংলা সাহিত্য সপ্তাহ’ উদ্‌যাপন-এসবই ছিল বিভাগে তাঁর একটি অবিস্মরণীয় সংযোজন। আবার ভাষা-চর্চায়ও ধ্বনির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণে মনোযোগী হয়েছিলেন এই ভাবেই, শুধু নিজের গবেষণাকে বিস্তৃতকরণের জন্যেই নয়, পাঠদানের ক্ষেত্রটিকে উন্নীত করার জন্যেও। তিনি বাংলা নাসিক্য-ধ্বনির সামগ্রিকতা, মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রকৃতি, সামগ্রিকতায় বাংলাধ্বনিতত্ত্ব ও অত্যাঙ্গ ধ্বনিপ্রকৃতি বিচার, ইংরেজি ও বাংলার বৈষম্যমূলক ধ্বনির সংগঠন-বিচার, ভাষা-পরিকল্পনা, সমাজভাষাতত্ত্ব, উপভাষা-বিশ্লেষণ এবং প্রাকৃত ভাষা বিশ্লেষণ প্রভৃতি নিয়ে যে কাজ করে গেছেন, তা ছিল তাঁর গবেষণার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ। বিশেষত তাঁর ‘ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব’ (১৯৬৪) প্রকাশের পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমলেন্দু বসু বলেছিলেন, ‘আগামী ৫০ বছরেও এ গ্রন্থকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না।’ আজ থেকে ৫৬ বছর আগে তিনি এ কথা বলেছিলেন। বাস্তবিক তা প্রফেটিক বাণীর মত নির্ভুল প্রমাণিত হয়ে আছে আজও।

এই ভাবে গবেষণার নানা ক্ষেত্রেই তিনি নতুন চিন্তার দ্বার উন্মোচন করে গেছেন। ‘রাজনীতির ভাষা’ও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে ছিল তার মাঝেই।

৩. একলা পথিক

কিন্তু পৃথিবী যখন নতুন ধারণার পথে এগিয়ে, তখন বাঙালি বিশেষত বাংলার পূর্বাংশে সে আলো বেশি ছড়ায়নি।

এমনকি রবীন্দ্রনাথও যতটা আধুনিক ছিলেন, রবীন্দ্রযুগ পেরিয়ে এসেও আমরা এখনও তা অধিগত করতে পেরেছি কিনা সন্দেহ।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহটা তো পাঠ্যগ্রন্থমূলক ছিল না। তাই অন্যদের কাছে আশানুরূপ ফল না পেয়ে শেষে তিনি নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামীকে নিয়োগ দান করে তাঁকে তিনি প্রত্যক্ষত সাহায্যও করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হয়ে, তিনি নিজেই পরে 'প্রাকৃত বাংলা'র ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করেন । এই ভাবে তিনি বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক বিবরণে প্রবেশ করেন। প্রফেসর হাইয়ের রবীন্দ্র-প্রীতির একটা কারণ এখানেও লক্ষ্য করতে পারি, আর সেটা হলো রবীন্দ্রচিন্তার আরব্ধ কাজের মাঝে একটি সমাপনী রেখা টেনে দেওয়া। প্রফেসর হাই এক্ষেত্রে ছিলেন একক গান্ডীব। এবং অবশ্যই 'আভা গার্দ'।

৪. অনুসৃতিহীন আদর্শ

পরবর্তী গবেষকেরা তাঁর অনুসারী হন নি। না হওয়ার কিছু বৈশ্বিক কারণও ছিল। সেটা ছিল তখন ভাষা-গবেষণায় মোড় নেওয়ার কাল। এই মোড় বা পরিবর্তনটা অস্পষ্টও ছিল বটে। এটা শুরু হয়েছিল তাঁর সমকালে, ষাটের দশকেই। টাইপোলজিস্ট বা স্ট্রাকচারালিস্টরা ছিলেন মাঝপথে। তাঁরা আগামী বিপ্লবটা অনুমান করতে না পারলেও তাঁদের ধারাও ছিল পরিবর্তন ও পরিশোধনযোগ্য। সৃষ্টিশীল বা সঞ্জননী ধারার আবহে তাদেরও নতুনভাবে চিন্তা করতে হচ্ছিল। তাদের বৈপরীত্যে বা সম্পূর্ণ বৈপ্লবিকভাবে চমস্কি মধ্য ষাটেই বাক্যতত্ত্বের গুরুত্ব ও টিজি ব্যাকরণের নব শৃঙ্খলাকে ভাষা গবেষণার সামনে নিয়ে আসেন তাঁর 'বাক্যের গঠনবিজ্ঞান বা সিস্ট্রা' এবং 'বাক্যের ভাব বা এসপেক্টস' গ্রন্থ দুটি দিয়ে। পরবর্তী কালে অবশ্য তিনি 'শাসন ও বন্ধন তত্ত্ব' দিয়ে এই আলোচনার এক মহা বিস্তার ঘটান। কিন্তু সে সময় লেবভ এবং সমাজভাষী অনেকেই তখন ভাষার গতিময়তা ও সমাজের শ্রেণীগত বৈচিত্র্যে ভাষাব্যবহার বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা দ্বারা ভাষার চারিত্র্য বুঝতে চেষ্টা করেন এবং এভাবে ভাষা-বিশ্লেষণের বিষয়টা ভাষার সাংগঠনিক ধারণার বাইরে নিয়ে আসেন। অবশ্য তাঁরা ফার্দিনা দ সস্যুরের ধারণাকেই অগ্রসরতা দেন তাঁদের কাজে শুধু সিনক্রনিক-ডায়াক্রনিক ধারণাকেই নয়, ভাষা-এককের প্রকৃতিতে সস্যুরীয় বাইনারি ধারণা থেকে ল্যাঙ্গ-প্যারল বা দ্যোতক-দ্যোতিতের ধারণা দিকেও। চমস্কির 'বিশ্বব্যাকরণ' এইসব ধারণাকে বাদ দিয়ে কোথায়? কিন্তু এই সব বিপ্লবী ধারণা বাংলায় অবশ্য এখনও অধরা। মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর কাজের প্রারম্ভিক পর্যায়েই অন্তরিত হন। তাঁর সম্পূর্ণ চিন্তার সাথে আমরা পরিচিত হতে পারিনি। তাঁর যে ভাষা-একক বা ধ্বনির বিশ্লেষণী চিন্তাটাকে আমরা এখনকার আলোচকদের হাতে পাই, হয়তোবা তা ছিল তাঁর পরবর্তী ধাপে এগুবার প্রাথমিক প্রয়াস। তাঁর ধারণার মৌলিকতার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ভাষার একক নির্ধারণে লন্ডনে যখন জোনসের ছাত্র বা অনুসারীরা 'কার্ডিনাল ভাওয়েল চার্ট' বা ছকেই নিবদ্ধ ছিলেন, আমেরিকায় ব্লুমফিল্ড থেকে হকেট পর্যন্ত সবাই 'মিনিমাল পেয়ার' এবং কৃচিৎ 'প্যাটার্ন

কনগ্রুইটি’ কিংবা ব্লক এন্ড ট্রেগারের ত্রিমাত্রিক ছক পর্যন্ত এগিয়ে ছিলেন, মুহম্মদ আবদুল হাই তখন ধ্বনির বাস্তব সংখ্যা নির্ণয়ে নিজস্ব ‘পাঠ-প্রতিকল্পন’ পদ্ধতিকে cv- ছক বা চার্টের অতিরিক্ত টেস্ট বা পরীক্ষণ-কৌশল হিসবে নির্ভরশীল বলে মনে করেছেন। এর অগ্রসরবাদী ভাববিন্দুটিকে আরও যৌক্তিক এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ পৈঠায় তিনি স্থাপিত করতে পারতেন, সে আয়ু তাঁকে বিধাতা দেন নি। একই ভাবে দেখা যায়, প্রসোডি তত্ত্বের ক্ষেত্রেও ফার্থিয়ান স্কুলের ডেলিয়েনেটার বা উদ্গাতা ফার্থ নিজেও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন প্রফেসর হাইকৃত তাঁর ঐ তত্ত্বের সম্প্রসারণ হাই সাহেবের নিজস্ব কৃতিত্বের কথা। এইভাবে ধ্বনি ও ধ্বনির গুচ্ছের যাবৎ বৈশিষ্ট্যিক পরিচয় নির্ণয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তারই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রয়েছে দেখতে পাই।

যাঁরা সাংগঠনিক ধারায় এবং কিছু পরে সঞ্জননী ধারায়ও এগিয়ে ছিলেন, তারা কোনও মৌলিক ধারার সূত্রপাত ঘটাতে চেষ্টা করেন নি। তারা দেখেছেন তাদের তত্ত্বও তখনই বাতিল হয়ে পড়ছে। আমি সেজন্য প্রফেসর হাই-কে ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনার ‘ফাউন্টেন হেড’ বলেছি। সেটা মিথ্যা নয়। ভাষা আলোচনায় ভাষার মূলে অর্থাৎ ধ্বনির পরিচয় নিতে আমাদের যেতেই হবে,- তা যেমন ওপরের গঠন বা বাক্য স্তর থেকে এগুলেও হবে, তেমনি অক্ষরের সূচনা ও স্বরের শেষ বা উপধা ধরে এগুলেও হবে। এবং তা এককেও যা, গুচ্ছেও তা, গুচ্ছায়ন বা বন্ধন-কৌশলের সকল স্তরেও তা, সর্বত্রই তা সমভাবে অব্যতিক্রমী।

চমস্কি ও হালের যৌথ গবেষণা যে শেষ অবধি মোড় নেয় এবং একক গবেষণায় ‘শাসন ও বন্ধন কৌশল’ এবং সেই সূত্র ধরে যে আরও এগুতে চাইলো, তার মানে বাক্যখণ্ডে ধ্বনির প্রকৃতিতে আসা পরিবর্তন সমূহের অন্যবিধ সূত্রেরও দাবী অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছিল তাতে। এই জন্য বলি প্রফেসর হাই একা কেন, চমস্কিও কি তাঁর নিজের অবস্থান থেকে সরে যান নি?। তাঁর *Principle and Parameter theory* (১৯৯০) পর্যন্ত এগিয়েও, সেখানেও নিজের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি তিনি । সম্প্রতিকালে অন্যান্য শিক্ষা-শৃঙ্খলার পণ্ডিতবর্গের আপত্তির মুখেও পড়তে হচ্ছে তাঁকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধারণা ও তত্ত্বের অগ্রবর্তি ব্যাখ্যা সত্ত্বেও। যেমন নিউরোবায়োলজিস্ট জিরাল্ড এডেলমানান্ড, টি.ডীকন কিংবা ল্যাঙ্গুয়েজ টাইপোলজিস্ট নিকোলাস ইভানস বা স্টিফেন লেভিন্সন প্রমুখেরা, যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে এখন ডয়েন, - তাঁরা চমস্কির যোগ্যতা বা সামর্থ্য (কম্পিটেন্স) ও সম্পাদন বা পারঙ্গমতা(পারফরমেন্স) এবং বিশ্বব্যাকরণের ধারণাগুলোকে বিভ্রষ্ট ও অগ্রহণযোগ্যও মনে করছেন। আমরা বুঝতে পারি এবং হয়তো এ প্রশ্নকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, ক্রমাগত সত্যান্বেষী চমস্কি কি তাহলে স্টিল এ রোলিং স্টোন মাত্র নয় ? তাহলে প্রফেসর হাই কেন ষাটের দশকে বাতিল হয় ?

প্রফেসর হাইয়ের পরে কাজী দীন মুহাম্মদ বা অন্য কারও গবেষণায় ধ্বনিগুণের সামগ্রিক ব্যাখ্যাটিতে ভিন্ন স্কুলের চিন্তার সহযোগের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ফোনিম-তত্ত্বে ধ্বনিতাত্ত্বিকরা যেমন চুলচেরা বিচার করেন, প্রসডিধর্মী ধ্বনি বিচারে সেখানে সাংঘর্ষিক তা নয়, কারণ মিলন মাধুরী মিশিয়ে কীভাবে মুখের ভাষার নিরুপম ঝঙ্কার অনুপম প্রকাশোপযোগী হয়ে ওঠে, সেটা উপলব্ধি করা তখন আর কঠিন হয় না। প্রফেসর হাই তাই 'প্রসডি' বলতে কি বোঝায় তা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, 'সেখানে stress, quantity (length- shortness), duration, prominence, pitch, rhythm ও intonation প্রভৃতি যাবতীয় গুণই - `all playing together like a chime of bells'.. .এ জন্য তিনি আবার বলেছেন, মার্কিনী দৃষ্টিতে যেখানে বলা যেত 'ফোনিমিক-বৈশিষ্ট্য', 'প্রসডি'র বিশ্লেষণে তাই হয়ে ওঠে 'prosodic property' বুঝিয়ে উদাহরণ দিয়ে বলেন, বি.পদ 'জননী', 'রমণী' এবং ক্রি.পদ 'নামানো' প্রভৃতিতে সংশ্লিষ্ট nasal phoneme-এর সাহায্যে এ-ধরণের নাসিক্য ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হলেও সমগ্র অক্ষর কি শব্দের উচ্চারণ থেকে তা একেবারেই আলাদা। এ কারণে তিনি দেখিয়েছেন, এ ধ্বনিলভ্য বৈশিষ্ট্যটি এই সব ক্ষেত্রে ('শব্দ ও শব্দাক্ষরে') 'phonematic না হয়ে prosodic property হয়ে দাঁড়ায় ।'

আজ লন্ডন স্কুলের অবদান আর স্বীকৃত হোক বা না হোক, তাদের প্রয়াসটি ছিল ঐতিহাসিক। প্রফেসর হাইয়ের সময় তাঁর বিভাগীয় সহকর্মীরা যাঁরা ভিন্ন শিক্ষা-শৃঙ্খলার সাথে জড়িত হয়েছিলেন, তাঁদের সাথে তাই বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যায় ভিন্নতা ঘটেছিল। তার গুরুত্ব ইতিহাসের দিক থেকে অল্পই। প্রফেসর হাইয়ের ধ্বনি বিচারে সামাজিক ধারণাটাই উঠে এসেছে। তাঁর লিখন ও বানান সংস্কারের কথাটি আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি। ভাষার যে কোনও রূপই লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ। সুতরাং বলা যায় ভাষা রাজনীতিরই একটি ভাষিক প্রকার।

৫. সমাজভাষা, ভাষার ব্যবহারিক রূপবিচার: প্রসঙ্গ রাজনীতি

ম্যান ইজ এ পলিটিক্যাল এনিম্যাল। এরিস্টটল এ ভাবেই মানুষ ও তার ভাষাকে দেখেছেন। মানুষ স্বভাবতই রাজনীতি করবে এবং সেখানে তাঁর ভাষা-প্রকৃতিতে আসবে রাজনীতির প্রভাব। রাজনীতিকরা তাদের ব্যবসায়ের বেসাতি করে বেতার বা টিভিতে প্রচারিত এবং মাঠ কাঁপানো রাজনৈতিক ভাষণ, কখনো বিতর্ক বা যুক্তিখণ্ডনের কোনও প্রক্রিয়া (যথা- আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বচন কালে ইরাক-যুদ্ধ নিয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী বারাক ওবামার বিপরীতে রিপাব্লিকান পার্টির প্রার্থীজন ম্যাককেইনের মধ্যকার বিতর্ক), জনতার উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রচারিত বক্তব্য, প্যাম্ফলেট, ঘোষিত দলীয় কর্মসূচি, দাবীনামা, দেয়াল লিপি, চিকা, বিজ্ঞপ্তি, ইশতিহার প্রভৃতি দিয়ে। এই সব ক্ষেত্রে

এক ধরনের জোরালো ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। কখনও বা কবিতাও ব্যবহার করা হয়। মুহম্মদ আবদুল হাই এ ক্ষেত্রে ভাষায় জার্মান 'রাইখ সংস্কৃতি সংসদের' (১৯৩৩) প্রপাগান্ডার উদাহরণ দেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন কোনও দলীয় রাজনৈতিক শক্তির প্রভাবে কিংবা যে কোনও দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতাশীন লোকের স্বার্থে (চমস্কির ভাষায় `violence of "rogue" states') 'নতুন শাসন-ব্যবস্থা'র মাধ্যমে তাদের 'রাজনীতির ধারা'য় এবং/বা দলীয় প্রয়োজনে একটা বিশেষ প্রকাশ-রীতি তাদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করা হলে এবং কার্যত 'রাজনৈতিক স্টীমরোলার' চালিয়ে তারা সে ভাষাকে তাদের 'হাতের পুতুলে' পরিণত করে তুললে, তখন সে ভাষার চারিত্র্যে একটা ভিন্ন রূপবন্ধ সৃষ্টি হবে; সেটাই স্বাভাবিক। এবং সংজ্ঞা মতে এটাকেই চিহ্নিত করা যায় 'রাজনীতির ভাষা' বলে।

কিন্তু তথাপি 'Island Effect' বলে যে একটা কথা আছে, এবং 'মিনিমালিস্ট থিওরী'-তে যার সমর্থন রয়েছে, তাতে তাত্ত্বিক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটতেও দেখা যায়। এখানে অবশ্য বলা দরকার, এ কালের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি এ ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কয়েকটা দিক থেকে তাঁর মতদ্বৈততা স্পষ্ট বোঝা যায়। গ্রথিত বা গর্ভবাক্যে স্বগর্ভতাকে (যাকে তিনি বলেন 'সেল্ফ-এমবেডিং' তথা স্বগ্রথিত বাক্যরূপ), তিনি গুরুতর পার্থক্যে বিবেচনা করেন। কারণ এ ক্ষেত্রে গঠনের স্তর বা ধাপগুলি অনেক হ্রস্ব বা সংকীর্ণ। তদুপরি তিনি তাঁর অবস্থানের দিক থেকে 'পলিটিক্যাল ডিসকোর্স' ও কথিত ভাষা-দুর্বৃত্তাচার-কে এক ভাবতে নারাজ। অর্থাৎ 'রাজনীতির ভাষা' স্বতন্ত্র কাঠামো এবং ব্যখ্যাপযোগী সৃজনতার ধারণাদানে সমর্থ বলে তিনি মনেই করেন না। তাই এর মীমাংসা-লক্ষ্যে কার্যকর কোনও তাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড় করানোর জন্য ('in the face of very effective systems of indoctrination and thought control') স্বীয় প্রতিষ্ঠিত পূর্ব ধারণার ব্যত্যয় ঘটাতে তাই অস্বীকৃত হন তিনি। তিনি বলেন, `all one needs is common sense and a few facts.' এখানে কোনও বিশেষজ্ঞতার সহায়তা জরুরী নয় বলেই তিনি মত প্রকাশ করেন। অন্যত্র তিনি আরও স্পষ্ট করেই বলেছেন, রাজনীতির ভাষা ভিন্ন ব্যাকরণের ধারণা সৃষ্টি করে না। সেখানে 'বিগ ডাটা'র সমাবেশ ঘটলেও সেটা হবে সিলিকন ভ্যালির বিজ্ঞানীদের মত 'কাঠামোবাদী' ধারণায় অন্ধ বিশ্বাস রাখার মত। তিনি শক্তভাবেই উল্লেখ করেন যে, `you could look at data forever. and you'd never figure out the laws, the rules, that are structure dependent.' স্কুলেই নিউটনের 'রুল অব নেচার' শেখে মানুষ যে, অবতরণকারী বিমানের যে নিয়ম, একটা গড়িয়ে নামা বলেরও সেই নিয়ম। অবশ্য একটু ঘুরিয়ে তিনি কথাটা বলতে চেয়েছেন এ ভাবে যে,: `just as rolling a ball down an inclined plane is something that tells you about the laws of nature.' Silicon Valley approach বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, 'just studying

masses of data and hoping something will come out'. কিন্তু এর কার্যকারিতা নেই কোথাও, না বিজ্ঞানে না ভাষা-বিজ্ঞানে (It does not work in sciences, and it doesn't work here.) এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনীতির ভাষা বা বাক্যিক কাঠামোর মধ্যে মনোভাষাতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলোকেও তিনি উপস্থিত করে দেখিয়েছেন যে, ব্যবহৃত বা বিদ্যমান কোনও ভাষার ভিত্তিতে যদি জনতা বা ভোটারদের সামনে অজ্ঞাতপূর্ব কোনও কৃত্তিম ভাষা উপস্থিত করা যায়, কেবল ইউনিভার্সেল গ্রামার (UG) বা সার্বজনীন ব্যাকরণের সাংগঠনিক সূত্র প্রয়োগ করে দেখলে এটা প্রমাণ করা কঠিন হবে না যে, SDR অর্থাৎ স্ট্রাকচার বা কাঠামো নির্ভর সূত্র প্রয়োগ ক্ষেত্রসমূহে ভিন্ন ভিন্ন মস্তিষ্ক ক্রিয়া সংগঠিত হবে। মস্তিষ্ক কার্যে (ব্রেন এক্টিভিটি) তে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হবে। চমস্কির সিদ্ধান্ত, এ ক্ষেত্রে 'people are essentially solving puzzles and not investigeting language.' এ ক্ষেত্রে তাঁকে অপর যে তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে তা হলো 'Island Constraints' এবং `Island Effects'. এগুলো তাঁর শেষ দিকের গবেষণার ফল। তবে চমস্কি কেবল যে কাঠামোবাদের বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন বলেই এ কথাগুলো বলেছেন তা নয়। তিনি যেমন বলেছেন, `I did not put aside my linguistic work, which continues up to the present day'. তেমনি বলেছেন স্কুলে ফোর্থ গ্রেডে থাকতেই এবং যখন তিনি 'ভাষাতত্ত্বে'র নাম গন্ধও জানতেন না তখন থেকেই তিনি ফ্যাসিবাদ, ভিয়েতনামের যুদ্ধ এবং শেষে ইরাকের যুদ্ধ যাকে তিনি বলেছেন,`the worst crime of the century',- এ সব নিয়ে লিখেছেন। থিওডোর ব্রাউনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন এসব লিখতে গিয়েই তিনি দেখেছেন ন্যুরেনবার্গ ট্রাইবুনাল কিংবা আফগান যুদ্ধ কিংবা আইএসআইএস-এর উদ্ভব শুধু যুদ্ধবাজদের পক্ষে বলা গুয়েবল-প্রচারের মত এক তরফা সত্যই ছিল না। কেউ যাকে বলছে 'a murderous act of aggression' অন্যেরা তাকেই বলছে, 'a strategic blunder,' বা তৃতীয়পক্ষ আবার তাকেই অবিহিত করছে 'It was a crime' বলে। অবয়ব (corpus) যাই ব্যবহৃত হোক, কথাটা নিউটনের প্রাকৃতিক সূত্রকেই ধারণ করে আছে। ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে ক্লিনটন বা ইরাক প্রসঙ্গে ওবামার কথা এবং স্বয়ং চমস্কির সেই যে - 'I was engaged in radical political activism long before I ever heard of linguistics ' এর সেই সব কথা, এ সবই তো চমস্কির শব্দে বলা যায় `public presentation'। সাধারণের প্রতিক্রিয়ার অভিপ্রকাশ ঘটেছে সেখানে। এ সব কথা সব সময় খোলামেলা বলা সম্ভব হয়নি। চমস্কির আত্মবিবরণীতেই তা আছে। অনেক কথা মানুষ নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করতো। চমস্কি তাই প্রশ্ন করেন, `who says that? Actually many people do, but nowhere near the mainstream. Certainly not in the journals..'

এই অপ্রচারিত প্রচারি ভাষাকে গ্রামসি তাঁর প্রবচন-সুলভ (aphorism) উক্তিতে বলেছেন শুভবাদ এবং অশুভবাদ বা আশা ও সাফল্যবাদ এবং নৈরাশ্যবাদ। ক্রমে এই অপ্রচারিত প্রচার্য ভাষা সমাজে অন্যগতি দান করেছে। চমস্কিকে এখানেও স্মরণ করতে হয়। তিনি এর ব্যখ্যায় বলেন, সমাজে এর জন্য কিছু উল্লেখযোগ্য প্রভাব ঘটেছে। 'দেয়ার হ্যাব বিন ভেরি সাবস্ট্যানসিয়াল গেইনস ইন মেনি ডোমেনস।' তার মধ্যে 'নারীর অধিকার' অন্যতম। অপর প্রধান প্রাপ্তি 'বাক-স্বাধীনতা'। তবে 'প্রগতি' হচ্ছে এর মূল কথা। চমস্কির অনবদ্য ভাষায় বললে,' All of that is progress. It didn't happen by magic. It happened by mass public organisation and activism. And we can build on that legacy. '।

৬. আলঙ্কারিক ভাষাপ্রয়োগের কৌশল (Rhetorical Strategies)

পূর্বে রূপক অলঙ্কারাদির উল্লেখ করা হয়েছে। কথায় আছে 'ভাষার বিষ'। রাজনীতির ভাষাও নীল। উল্লিখিত ওবামার নির্বাচনী বক্তৃতা রাজনৈতিক ভাষা ব্যবহারের একটি চমৎকার উদাহরণ হয়ে আছে। এর ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় 'করপাসে' নিম্নরীতি সমূহের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল, যথা- metaphors, metonymies, analogies, pronouns, the active or passive voice of transitive verbs, sound-bites, three-part lists and contrastive pairs- ইত্যাদি। এগুলো ভাষায় সুবচন ব্যবহারের আধার। বাংলাদেশে এর প্রয়োগের শিক্ষা আমাদের কম। এক সাংবাদিক একে বলেছেন 'সুবচনের নির্বাসন'। প্রফেসর হাই তাকে বলেছেন 'খেউড়'।

মুহম্মদ আবদুল হাই ঢাকার দুটো পত্রিকার সংবাদের উদ্ধৃতি দেন - দৈনিক আজাদ এবং দৈনিক ইত্তেফাক। একটা মুসলিম লীগ সমর্থক, অপরটি আওয়ামী লীগ সমর্থক। "আরও স্মরণ করতে পারি ইত্তেফাকের মোসাফির রচিত 'রাজনৈতিক মঞ্চ', ও ভীমরুল রচিত 'মিঠে কড়ার' বিবরণ এবং আজাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলো।' উল্লিখিত পত্রিকাদুটোতে একই সংবাদের প্রকাশগত বৈচিত্র্য দেখা যেত, কিন্তু যে পত্রিকার সংবাদ দেশবাসীদের মনের কথা বোঝাতো, তার সংবাদ শিরোনাম এবং বিবরণীই হতো আকর্ষণীয় ও লোক-রঞ্জক, লেখকের ভাষায় 'প্রাণব্যঞ্জক এবং বর্ণনার ভাষাপ্রয়োগ ক্ষেত্রবিশেষে আক্রমণাত্মকও।' কিন্তু বিতর্কমূলক রাজনৈতিক সংবাদগুলো এমনভাবে পরিবেশিত হতো যে স্বতন্ত্রভাবে দুটো পত্রিকার সংবাদই মনে হতো এর চেয়ে সত্য কিছু নেই। সিদ্ধান্তে লেখক তাই বলেন, 'নিজের ভাষার ওপরে মানুষের জন্মগত অধিকার থাকলেও দেশের রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে তার ভাষা ব্যবহারের শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়-সে ভাষা সে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না। '

প্রবন্ধের শেষ ভাগে লেখক যে প্রসঙ্গটি এনেছেন তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের ভাষা প্রচার-নির্ভর, তার শক্তিও নির্ভর করে প্রচার-মাধ্যমের কারণে। সম্প্রতিকালে যুদ্ধে যেমন 'মাইট' এবং 'রাইট' শব্দদুটোই চূড়ান্ত, তেমনি প্রচার মাধ্যমগুলো অর্থাৎ 'হাল আমলে সংবাদপত্র, রেডিও, সাহিত্য, সিনেমা প্রভৃতি ভাষা ব্যবহারের বিচিত্র বাহনগুলো ভাষার ব্যবহারমুখী শক্তিকে প্রচণ্ড গতিতে দান করেছে আর তাকে মারাত্মকভাবে শক্তিশালী করে তুলেছে।' এই ভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো তাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুসারে জনমত গড়তে গিয়ে দেশের ভাষাকে তাদের প্রচারমুখী আদর্শের বাহন করে তোলে। তাদের রাজনৈতিক চিন্তা বা দর্শন অনুযায়ী ভাষার ধরণ বা মান গড়ে উঠবে। 'যেনতেন প্রকারে ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলো কলহ-কোন্দলে লিপ্ত হয়- ফলে রাজনৈতিক ভাষা শালীনতা হারায়।' দলীয় আদর্শ ও দর্শনের কারণে প্রত্যেক দলের মধ্যে 'শিক্ষা ব্যবস্থার বন্দোবস্ত' না থাকলে ভাষা-ব্যবহারে চ্যুতি ঘটতে বাধ্য। ভাষায় অলঙ্কার প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য শ্রোতার মন অনুকুলে আনা, অনুগত করা, সেখানে তা প্রতিকুলতা সৃষ্টি করে। এজন্যই আমরা রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যে অনায়াসে বলে ফেলি, 'এই সরকার টপ টু বটম চোর', 'প্রধানমন্ত্রী সারাদিন মিথ্যা কথা বলেন'। পাকিস্তানী আমলে আবুল হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভাকে বলা হয়েছিল 'লুটপাটের কোম্পানী' ইত্যাদি। মন্ত্রীসভার সদস্য ৪০ জন হলে আলীবাবার কাহিনীর সাথে মেলানো হতো।

সমাজভাষাবিজ্ঞানী Neil Corlett এ রূপ ক্ষেত্রে Strategies of persuation (SP)-এর কথা টেনে এনেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, `SP in political speeches can be used to impose certain moral or ethical values in people.' তাঁর মতে `language of politics are not primarily prosperous because they are correct or true, instead, it may be more dependent on how valid the arguments seem.' মুহম্মদ আবদুল হাইও সে কথাই বলে গেছেন আরও আগেই। ভাষার দুই রূপ Confrontal এবং Convincing. Political ভাষার উদ্দেশ্য নিয়ে Neil Corlett বলেন, 'it is important to be aware of how politicians use rhetorical strategies in order to convince an audience of the rectitude of war.' খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এথেন্স নগর-রাষ্ট্রের প্রধান পেরিক্লিস দীর্ঘস্থায়ী পেলোপনেসিয়ান ওয়ারের এক পর্যায়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ স্পার্টানদের প্রশংসা করেই দলীয় সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করে বিজয় এনেছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল এ রকম: 'যা কিছু সুন্দর তার জন্যই আমাদের ভালবাসা, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্য নয়।... ।' কনফুসিয়াসও রাষ্ট্রশক্তির সাথে প্রজাশক্তির শুভ মিলন চেয়েছিলেন। আমাদের রাজনীতি কল্যাণমুখী নয়, তার ভাষাও কোনও কল্যানীয় ভাবনা-চিন্তার ওপর গড়ে ওঠে নি। এই রাজনীতি আমাদের সংস্কৃতির

পরিচায়ক নয় কিংবা ভাইসভার্সা। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশের সংস্কৃতির রাজনৈতিক পরিচয় ঘটে নি। 'এগ্রিকালচার' বুঝতে ugliculture কথাটাই সামনে এসে যায়।

রাজনীতি এসেছে রাজার নীতি থেকে। আজ তা কূর্মবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। রাজনীতি হতে সুবচন গেছে, নীতিও বুঝি অপনীতির রং ধরছে। প্রফেসর হাই তাঁদের সময়ের 'অতীত রাজনৈতিক জীবনের দুর্গতির মধ্যে তৎকালীন নেতৃবৃন্দের ভাষা ব্যবহারের রূপ ও ধরণের' জন্য দুঃখ করে গেছেন। রাজনীতির হালচাল এবং রাজনীতির ভাষার সেই দুর্গতির দিন শেষ হয়েছে কিনা জানি না, শুধু প্রশ্ন রেখে যাই সেই 'দুর্গতি' থেকে আমরা কি আজ মুক্ত?

অন্ত্যটীকা

১। এই প্রবন্ধটি ২৬ শে নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে আরসি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত পঠিত এবং ঈষৎ পরিবর্তিত।

তথ্যনির্দেশ

মুহম্মদ আবদুল হাই। (১৯৯৪)। *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মনিরুজ্জামান। (২০০০)। 'অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই: তাঁকে শ্রদ্ধা', *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ [সম্পা.]। (২০০৭)। *ভাষা ও সাহিত্য*, খণ্ড-৬। ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

Chomsky, N. (1990). *Language and problems of knowledge: The Managua lectures*. MIT Press.

Saussure, F. de. (1916). *Cours de linguistique générale* [Course in General Linguistics]. (C. Bally & A. Sechehaye, Eds.). Payot.

Bloomfield, L. (1933). *Language*. Holt, Rinehart and Winston.

Hockett, C. F. (1958). *A course in modern linguistics*. Macmillan.

Block, J. H., & Trager, G. L. (1942). *Outline of linguistic analysis.* Waverly Press.

Jones, D. (1918). *An outline of English phonetics*. Teubner.

Nebrija, A. de. (1492). *Gramática de la lengua castellana*. Salamanca.